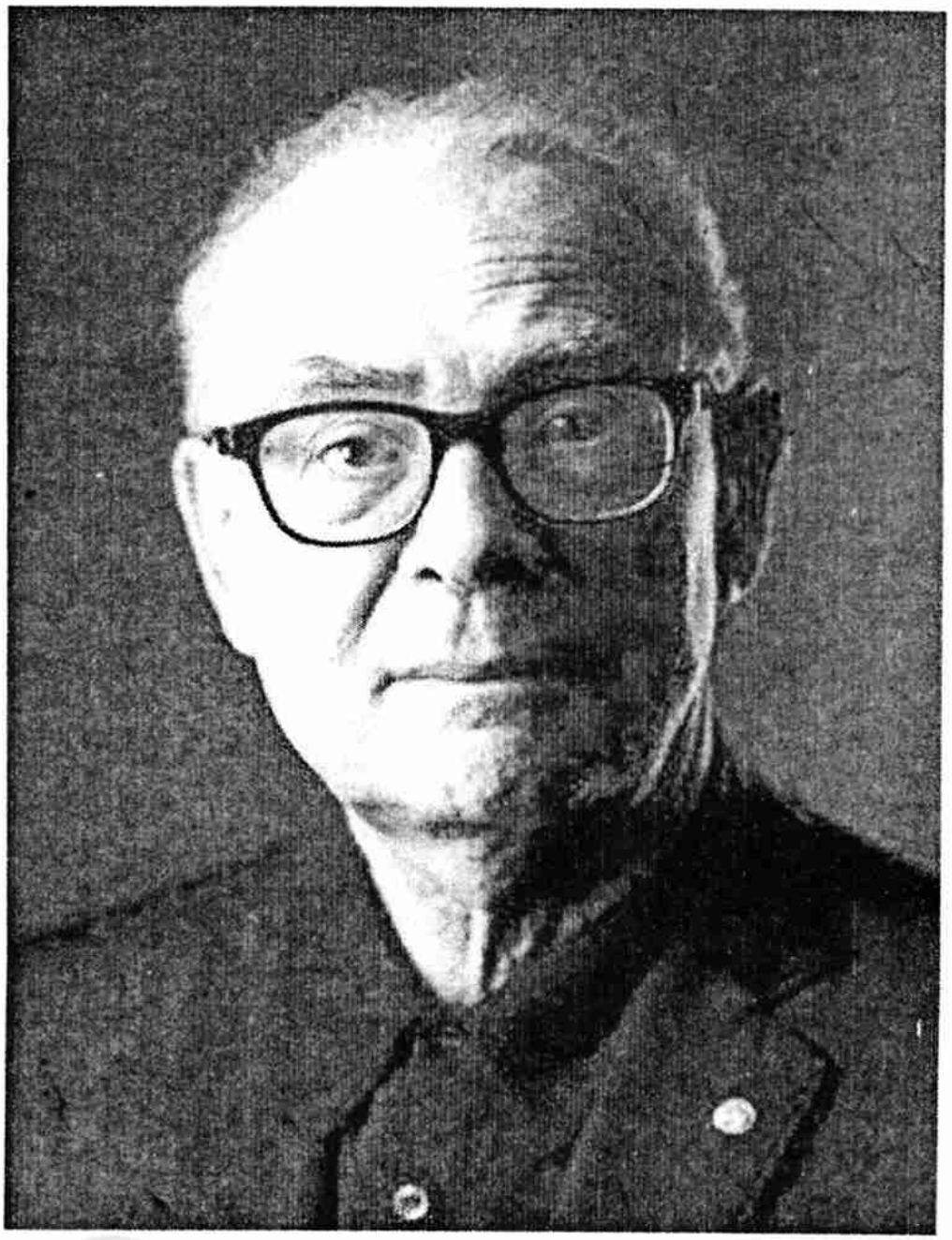

পাত্রিক মোদিয়ানো-র নোবেল বক্তৃতা

অনুবাদ: শর্মিষ্ঠা ঘোষ/বোধিসত্ত্ব ঘোষ

প্রথমেই বলি, আজ আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত আমি। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির যে-সম্মান আপনারা আমাকে দিয়েছেন তা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে।

জীবনে প্রথমবার এই বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সামনে বলতে গিয়ে আমি ঠিক স্বস্তিতে নেই। আপনাদের মনে হতে পারে একজন লেখকের পক্ষে বলার কাজটা খুবই সহজ। কিন্তু এ-কথা সত্য, একজন লেখকের, বিশেষত একজন ঔপন্যাসিকের বক্তৃতার সঙ্গে খুব একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। স্কুল-জীবনের কথা মনে রেখে এ-কথা নিঃসন্দেহে

বলা যায় যে, মৌখিকের তুলনায় লিখিত পরীক্ষায় একজন ঔপন্যাসিকের প্রতিভার পরিচয় আমাদের কাছে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাবজগতে সে শান্ত, স্থির। কিন্তু প্রয়োজনে ভিড়ের পরিবেশেও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। স্থিত প্রকৃতি তাকে চারপাশে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে। আবার প্রয়োজনে কিছু প্রশ্ন তার জিজ্ঞাসু মনে এনে দেয় উত্তর। বাচনভঙ্গিতে পিছিয়ে-থাকা এই মানুষটি বক্তার ভূমিকায় কী বলবে বুঝতে না পারায় প্রায়শই তার কথা দ্বিধাগ্রস্ততায় আক্রান্ত হয়। লেখার ক্ষেত্রে খসড়ার ক্রমাগত পরিমার্জনের ভিতর দিয়ে সে তার স্বকীয়তা খুঁজে পায়, কিন্তু বক্তার ভূমিকায় বক্তব্যের শেষে মন দ্বিধাগ্রস্ত বাক্যকে আর ফিরিয়ে নিতে পারে না।

মনে পড়ে, কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, আমাদের ছেলেবেলায় ছোটোদের কথা বড়োদের কাছে কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত না। ফলে, তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিত। দ্বিধা, প্রতি ক্ষেত্রে বাধা পাওয়ার তীব্র আশঙ্কা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। শৈশবের শেষপ্রান্তে এসে আমার প্রতিবাদমুখর মন হাতে কলম তুলে নিল। শুধু আমি নয়, এরকম অনেকেই আছেন। আমার মনে হয়েছিল এর মধ্য দিয়ে আমি বড়োদের কাছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে খুব সহজে পৌঁছে যাব।

আজকের এই পুরস্কার ঘোষণা আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। বারংবার মনে হচ্ছে, এর জন্যে আমিই কেন! আজ বুঝলাম, একজন ঔপন্যাসিক তার বই সম্পর্কে যতটা কম জানে, একজন পাঠক সেই বইটি সম্পর্কে ঠিক ততটাই অবগত থাকে। একজন লেখক তার লেখা সংশোধন ও পরিমার্জন করতে পারে মাত্র, কিন্তু কখনোই তার পাঠক হয়ে উঠতে পারে না। যেমন একজন চিত্রশিল্পী যখন কোনো সিলিংয়ে ফ্রেস্‌কো নির্মাণে রত থাকে তখন তার একটা সামান্য অংশই তার চোখের সামনে থাকে। ঠিক সেরকমই একজন লেখকের নিজের বই সম্পর্কে ধারণাটিও নিতান্ত আংশিক।

লেখালেখি একান্তই ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। একটা উপন্যাস লেখার শুরুতে লেখক কিছুটা দোলাচলে থাকে। প্রতিদিনই অনুভব করে সে ভুল পথে চলেছে। এর ফলে, ভিন্ন পথে চালিত হবার তীব্র ইচ্ছে তাকে চেপে ধরে, কিন্তু এই ইচ্ছের বশবর্তী না হয়ে এগিয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এটা অনেকটা অদৃশ্য পথে শীতের রাতে গাড়ি চালানোর মতো— যেখানে রাস্তা বন্ধ এবং কুয়াশা কেটে যাওয়ার আশা নিয়ে শুধুই এগিয়ে চলা।

একটা বই যখন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, লেখক তখন থেকেই একটা মুক্তির স্বাদ পেতে আরম্ভ করেন। এই তৃপ্তি অনেকটা স্কুল ছাত্রের গ্রীষ্মকালের আগের শেষ ক্লাসটির মতো— সেইসময় তাদের পড়ায় না থাকে মন, না মানে শিক্ষকের শাসন। বইয়ের শেষাংশে সে লেখকের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই শেষ শব্দে পৌঁছাবার আগেই বইটির কাছে লেখক অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। লেখার পালা শেষ— লেখকের ছবি মুছে দিয়ে বই পেল পূর্ণতা। এখন থেকে পাঠকের চোখ দিয়ে সে নিজেকে চিনবে। এই সময় লেখকের মধ্যে এক গভীর শূন্যতা ও বিরহের বোধ জেগে ওঠে। বইয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হওয়ার

হতাশা গ্রাস করে তাকে। তার অতৃপ্তি তাকে নতুন বইটি লেখার পথে চালিত করে, যদিও পরিপূর্ণ তৃপ্তি কখনোই আসে না। বছরের পর বছর লেখার পর লেখা, আলোচনার পর আলোচনা— কিন্তু লেখকের কাছে এটি নিতান্তই এক তাৎক্ষণিক ব্যাপার।

এটা ঘটনা, একটি বই সম্পর্কে পাঠক লেখকের থেকে বেশি অবগত থাকেন। ডিজিটাল ফোটোগ্রাফির আগের যুগে ডার্করুমের অন্ধকারে একটি ছবি যেমন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হতো, পাঠক যখন কোনো উপন্যাস পড়তে পড়তে এগোন, সেই একই রাসায়নিক বিক্রিয়া এক্ষেত্রেও কাজ করে। গানে যেমন হঠাৎ চিৎকার অপেক্ষা আস্তে সুর লাগানো শ্রোতার মনকে কোমলভাবে স্পর্শ করে, এক্ষেত্রেও লেখকের লেখার ধরন পাঠককে লেখার সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করে। অনেকটা আকুপাংচার চিকিৎসাপদ্ধতির মতো, যেখানে শরীরের সঠিক বিন্দুতে সুঁচ ফোটানোর মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্রের চিকিৎসা হয়।

আমার বিশ্বাস, পাঠক এবং লেখকের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ এবং পরস্পর পরিপূরক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার সন্ধান সংগীত জগতেও পাওয়া যায়। মনে হয়, লেখালেখি ও সংগীতের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব কাছের। যদিও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সংগীতের স্থান কলমের অনেক ওপরে। এবং এই কারণেই আমি সুরস্রষ্টাদের ঈর্ষা করি। যাদের সৃষ্টি শিল্পগত দিক থেকে উপন্যাসের অনেক ওপরে। বরং ঔপন্যাসিকদের থেকে কবিদের অবস্থান সুরস্রষ্টাদের অনেক কাছাকাছি। 'নিকৃষ্ট কবি থেকেই গদ্য লেখকের জন্ম হয়'— কোথাও পড়া এই পঙ্‌ক্তিটি ছেলেবেলায় আমাকে কবিতা লিখতে আকৃষ্ট করে। সংগীত এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত মিল থাকলেও একজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি একজন সংগীতস্রষ্টার শিল্পসৃষ্টির থেকে কখনোই বেশি মনোমুগ্ধকর হতে পারে না— শঁপ্যার *Nocturnes*-এর মতো কিছু সৃষ্টি না করতে পারার আক্ষেপ লেখককে গ্রাস করে।

আমার নিজের এবং অন্যান্য অনেক উপন্যাস লেখকের ক্ষেত্রে দেখেছি লেখকের প্রতিটি নতুন সৃষ্টি পুরোনোর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়। আমার মনে হয়, আমি ঘুমে আধো-জাগরণে, বইয়ের পর বই জুড়ে যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি লেখাই লিখে চলেছি— একই নাম, একই জায়গা, একই বর্ণনা যেন একই ছাঁচে জড়িয়ে আছে সেই লেখার গায়ে। লেখা চলাকালীন একজন ঔপন্যাসিককে দেখলে মনে হয় সে যেন জগৎ-বহির্ভূত অন্য কেউ, যেন ঘুমের মধ্যে হেঁটে-চলা একজন মানুষ। যদিও এ-কথা ভুললে চলবে না, ঘুমের মধ্যে হেঁটে-চলা মানুষরা ছাদের আলসে ধরে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে।

আমার নাম নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে ঘোষণার সময় এই উল্লেখও করা হয়েছে যে, আমার লেখালেখি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অধিগৃহীত দেশের জনজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছে। ১৯৪৫ সালে জন্ম-নেওয়া আরো অনেকের মতো আমিও যুদ্ধেরই সন্তান। আমার জন্ম পারি-তে, বলা ভালো অধিগৃহীত পারি-তে। সেই সময়ের বাসিন্দারা পারি-কে যতদূর সম্ভব ভুলে যেতে চাইবেন অথবা মনে রাখতে চাইবেন কিছু টুকরো টুকরো সুখস্মৃতি যেগুলি ছিল নিছকই মরীচিকা। বেঁচেবর্তে-থাকা মানুষদের কাছে এই সময়টা ছিল এক

ভিত্তিহীন দুঃস্বপ্ন। পরবর্তীকালে পারি-র ওই সময় সম্পর্কে শিশুদের বিভিন্ন প্রশ্ন বাবা-মায়েরা এড়িয়ে যেতেন। কখনো কখনো এমনভাবে নিরুত্তর থাকতেন যেন তাঁরা চাইছেন সেই কালো দিনগুলোর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে, ছোটো ছোটো শিশুদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তাঁরা নিরুত্তর থাকলেও সেই সময়টার ছবি আমরা মনে মনে এঁকে নিতে পারতাম।

অধিগৃহীত পারি ছিল এক আশ্চর্য জগৎ। সিনেমা-থিয়েটার, গান-বাজনা, সরাইখানা— এই-সব বাহ্যিক উপাদান নিয়ে জীবন যেন আগের মতোই বয়ে চলছিল। রেডিওতে গান বাজত, সিনেমা-থিয়েটারে লোকের উপস্থিতি অনেক বেশি হতো। এই জায়গাগুলো হয়ে উঠেছিল মানুষের মিলিত হওয়ার এবং উদ্দীপনা খুঁজে নেওয়ার আশ্রয়। কিন্তু কিছু উদ্ভট খুঁটিনাটি প্রমাণ করে দিত যে পারি আর আগের মতো নেই। গাড়ির সংখ্যা অনেক কমে গেছিল। এটি হয়ে উঠেছিল এক নিঃস্তব্ধ শহর। সেই নিঃস্তব্ধতা থেকে উঠে আসত পাতার মর্মর শব্দ, ঘোড়ার খুরের খুটখাট, মানুষের পায়ের শব্দ আর কথার গুনগুনানি। নিঃস্তব্ধ রাস্তাঘাট আর শীতের বিকেল ঠিক পাঁচটায় 'ব্ল্যাক আউট'— সব মিলিয়ে শহরটিকে মনে হতো অস্তিত্বহীন এবং নাৎসি দখলদারদের কাছে এটি ছিল এক ঘুমন্ত শহর। বড়ো-ছোটো যে-কেউ যে-কোনো সময় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। এই আতঙ্কের পরিবেশ মানুষের সঙ্গে মানুষকে মন খুলে কথা বলতে দিত না।

দুঃস্বপ্নের সেই পারি-তে একজন খুব সহজেই আঙুল তুলত আর-একজনের দিকে। সুসময়ে যারা পরস্পরের মুখদর্শন করত না, তাদেরও দেখা গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশতে। কারফিউয়ের সেই ভারী আবহাওয়ায়, জন্ম নিত কিছু ক্ষণভঙ্গুর ভালোবাসার সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক জন্ম দিত কিছু সন্তানের। এই কারণেই অধিগৃহীত পারি আমার কাছে ছিল আদিম অন্ধকারে ঘেরা এক শহর। এই পারি ব্যতীত 'এই আমি'-র জন্ম হয়তো হতো না। সেই পারি আজও আমায় তাড়া করে ফেরে এবং আমার লেখা কখনো কখনো তারই ম্লান আলোয় স্নাত।

এই-সব ঘটনা প্রমাণ করে একজন লেখক রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় না থাকলেও, এমনকি গজদন্তমিনারবাসী হলেও, তার লেখায় 'সময়ের ছাপ' থেকেই যায়। যদি সে কবিতা লেখে, তাতে 'তার সময়' যেভাবে প্রতিফলিত হয়, অন্য কোনো সময়খণ্ডে বাস করে তা সম্ভব নয়।

মহান আইরিশ কবি ইয়েটস-এর 'The white swans at pool' কবিতাটির ক্ষেত্রে এটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একটি পার্কে বসে কবি সন্তরণরত একটি রাজহাঁসকে দেখছেন—

The nineteenth Autumn has come upon me
Since I first made my count;
I saw, before I had well finished,
All suddenly mount

And scatter wheeling in great broken rings
Upon their glamorous wings.

But now they drift on the still water
Mysterious, beautiful;
Among what rushes will they build,
By what lake's edge or pool
Delight men's eyes, when I awake some day
To find they have flown away?

উনিশ শতকের কবিতায়— বিশেষ করে বোদলেয়ার বা মালার্মে-র লেখায় রাজহাঁসের উল্লেখ প্রায়শই মেলে। কিন্তু ইয়েটস-এর এই কবিতাটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বসে লেখা সম্ভব ছিল না। এর মধ্যে এমন একটি ছন্দ এবং বিষাদময়তা আছে যা তাকে বিংশ শতকে তো বটেই, এমনকি যে-বছর কবিতাটি লেখা সেই সময়কালকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই শতকের একজন লেখকের মনে হয় সে যেন তার সময়ের হাতে বন্দি এবং ঊনবিংশ শতকের মহান ঔপন্যাসিক— বালজাক, ডিকেন্স, তলস্তয়, দস্তয়েভ্স্কি— প্রমুখের লেখা তাকে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত করে। সে-যুগের ধীর, শান্ত জীবন ওই সময়কার লেখকদের লেখালিখির সহায়ক হয়ে উঠেছিল কারণ তাঁরা মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারতেন।

এদিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের প্রজন্ম একটা 'ট্র্যানজিশন'-এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এবং আমি কৌতূহলী এটা জানতে যে, আমার পরবর্তী প্রজন্ম, যাদের জন্ম মোবাইল ফোন, ই-মেল এবং টুইটের যুগে, যাদের জীবনে থাবা বসাচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং ফলস্বরূপ জীবন থেকে কমে যাচ্ছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, যা আমাদের সময়ে ছিল উপন্যাসের একটি প্রধান উপাদান, তা কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করছে। কিন্তু তবু আমি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী এবং আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের লেখকরা উত্তরাধিকারের পতাকা যোগ্যতার সঙ্গে বহন করবে। এই ট্রাডিশন সেই হোমারের সময় থেকে পায়ে পায়ে পথ চলছে।

একজন লেখক তার সমসাময়িক সবকিছুকে অতিক্রম করে সর্বদা নতুন কিছু সৃষ্টির দিকে ধাবিত হয় এবং এ-কথা সব শিল্পীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রেসিন বা শেক্সপীয়ার-এর নাটকের ক্ষেত্রে কুশীলবদের পোশাক কখনই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না, কারণ এটি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। তলস্তয়-এর আনা কারেনিনা লেখার দেড়শো বছর পরেও পড়ার সময় আমরা এতটাই একাত্ম হয়ে যাই যে, খেয়ালই থাকে না যে-পোশাক সে পরে আছে তা ১৮৭০ সালের; এবং এডগার অ্যালান পো, মেলভিল বা স্তাঁদাল-এর মতো লেখকদের লেখালেখির প্রকৃত মূল্যায়ন হতে তাঁদের মৃত্যুর পরেও পেরিয়ে গেছে দু'শো বছর।

শেষ পর্যন্ত একজন লেখক তার লেখার থেকে কতটা দূরে? জীবনের সীমারেখায় তার বর্ণনা দিতে দিতে সে যেন চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়। তাতে সামান্য দূরত্বটুকুও থাকে

না, যার দ্বারা লেখক তার চরিত্রের পরিচয়টুকু আলাদা করে দেখতে পারে। তলস্তয় মুহূর্তে এক হয়ে যেতেন সেই মহিলার সঙ্গে যাকে তিনি রাশিয়ায় দেখেছিলেন একরাত্রে চলন্ত ট্রেনের নীচে শরীর ছুঁড়ে দিতে। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা দেওয়ার সময় তার সঙ্গে যেভাবে জড়িয়ে যেতেন, আনা ক্যারেনিনা-র চোখের পাতার ওঠা-নামাও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করত। এই পরিবর্তনের ফলে লেখার খুঁটিনাটি চিন্তা লেখককে এক আত্ম-অবচেতনার জগতে নিয়ে যায় যা 'নার্সিসিজম'-এর ঠিক বিপরীত। এরই সঙ্গে থাকে এক আপাতবিচ্ছিন্নতা যা কখনোই অন্তর্মুখীনতা নয় এবং যা বহির্জগৎ পর্যবেক্ষণে ও তাকে উপন্যাসে তুলে আনতে লেখকের সহায়ক হয়।

আমার সবসময়ই মনে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ এবং আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ, এমন মানুষের জীবনেও কবি-ঔপন্যাসিকরা অসাধারণত্ব আরোপ করতে পারে। এটা সম্ভব হয় তাদের দীর্ঘদিনের অনুপুঙ্খ এবং প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার জন্য। দৈনন্দিন জীবনের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় তাদের হাত ধরে— এ যেন গভীর অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর স্পর্শ। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্নিহিত রহস্যকে উন্মোচিত করাই কবি-ঔপন্যাসিক-চিত্রকরদের দায়। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমেদিও মোদিগ্লিয়ানি-র কথা মনে পড়ছে। তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কাজে তিনি মডেল হিসাবে নিতান্ত নাম-না-জানা মানুষদের বেছে নিয়েছেন— কেউ শিশু, কেউ পথের কোনো মেয়ে, কেউ পরিচারিকা, কেউ-বা তরুণ কৃষক। তিনি তাদের চিত্রিত করেছেন ব্রাশের বলিষ্ঠ আঁচড়ে— অনেকটা তাসকান ঘরানার বত্তিচেল্লি বা কোয়াত্রোসেন্দ্রো গিয়াস-এর ঢঙে। তিনি তাদের আপাত-সাধারণ উপস্থিতির গভীরে যে সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে তাকে উন্মোচিত করেছেন। একজন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিও একই পথের পথিক। লেখকের কল্পনা সত্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে তার গভীরে পৌঁছায় এবং ইনফ্রারেড বা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির মতো লুকোনো সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। আমি বিশ্বাস করি একজন ঔপন্যাসিক প্রকৃত অর্থে অপরিসীম অনুমান ক্ষমতার অধিকারী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তিনি এক সিস্‌মোগ্রাফ-এর মতো— সামান্য কম্পনও যাতে ধরা পড়ে।

আমার প্রিয় কোনো লেখকের জীবনী পড়ার আগে আমি দু'বার ভাবি। জীবনীকাররা প্রায়শই নির্ভর করে থাকেন অসম্পূর্ণ তথ্য, অনির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, ধোঁয়াটে এবং হতাশাজনক চরিত্রের বিবরণের ওপর। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অবাঞ্ছিত শব্দ এড়িয়ে রেডিওতে গান বা কথা শোনার চেষ্টার মতো কষ্টকর। প্রকৃতপক্ষে, লেখাই একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, জীবনী নয়।

কোনো লেখকের জীবনী পড়তে গেলে প্রায়শই এমন কিছু ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় যা হয়তো তাঁর অজান্তেই তাঁর মধ্যে লেখার বীজ বুনে দিয়েছিল এবং সেই ঘটনাগুলিই পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আলফ্রেড হিচকক-এর কথা— লেখক না হলেও যাঁর সিনেমায় আছে উপন্যাসের শক্তি ও আকর্ষণী ক্ষমতা। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স, হিচককের বাবা এক পুলিস অফিসার বন্ধুকে একটি চিঠি

পাঠান হিচকক-এর মাধ্যমে। সেই পুলিস অফিসার তাঁকে অপরাধীদের সঙ্গে একই জায়গায় আটকে রাখেন। এক ঘণ্টা বাদে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত শিশুটিকে বের করে আনেন এবং বলেন—"এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ জীবনে খারাপ কাজের পরিণাম কী হতে পারে।" হিচকক-এর সিনেমায় আতঙ্ক ও উদ্‌বেগ-ঘন যে-পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার পেছনে নিশ্চিতভাবে সেই পুলিস অফিসার এবং শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিচিত্র মনোভাবের প্রভাবও আছে।

এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনি শুনিয়ে আপনাদের বিরক্তি আর বাড়াব না। এটুকু বলতে পারি, আমারও কোনো কোনো বইয়ের বীজ বুনে দিয়েছিল শৈশবের কিছু ঘটনা। বেশিরভাগ সময়ই আমি বাবা-মাকে ছেড়ে কিছু স্বল্প পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বাড়িতে কাটিয়েছি। ছেলেবেলার কোনো কিছুতেই মানুষ খুব একটা বিস্মিত হয় না এবং অনেক ঘটনাকেই তার নেহাত সাধারণ ঘটনা বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে শৈশবের সেই ঘটনাগুলো, বাসস্থানগুলো, আশপাশের পুরোনো মানুষ আমার মনকে নাড়া দিয়েছে বারংবার। যদিও পুরোনো সেই ঘর-বাড়ি এবং মানুষজন কোনো ভৌগোলিক অনুপুঙ্খে আমার স্মৃতিতে আসে নি। লেখার-মাধ্যমেই আমি চেষ্টা করেছি রহস্য উদ্‌ঘাটন করে হারিয়ে যাওয়া সূত্রগুলোকে খুঁজে পেতে।

রহস্য প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে ঊনবিংশ শতকে লেখা ফরাসি উপন্যাস *পারি-র রহস্য*-এর কথা মনে আসছে। আমার জন্ম-শহর পারি-র স্মৃতি আমার শৈশব স্মৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং আমি যেন এই শহরের রহস্যময় চরিত্র আজও সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি। তখন আমি নয় কি দশ, একদিন সেইন-এর ডান তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম এক অজানা-অচেনা জায়গায়, মনে ছিল হারিয়ে যাওয়ার ভয়। দিনের আলো আমাকে ভরসা জুগিয়েছিল।

বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে এই ভয় কাটানোর প্রবল চেষ্টার পাশাপাশি শুরু হলো শহর জুড়ে, শহর ছাড়িয়ে আমার রোমাঞ্চকর নৈশভ্রমণ। এই পদ্ধতিতে শহর চেনার ব্যাপারে আমি আমার সেই-সব প্রিয় ঔপন্যাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম যাঁদের হাত ধরে উনিশ শতক থেকেই পারি, লন্ডন, সেন্ট পিটার্সবার্গ বা স্টকহোম এক-একটা উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এডগার অ্যালান পো-র *দা ম্যান অফ দা ক্রাউড* বইটির বিষয় ছিল একজন সাধারণ মানুষকে ঘিরে। গল্পে জানলা দিয়ে একজন সাধারণ মানুষকে দেখা যাচ্ছে। বহু চেষ্টা করেও যার সম্পর্কে বেশি কোনো তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। এইরূপ কত সাধারণ মানুষ লুকিয়ে আছে সাধারণের ভিড়ে, যারা প্রকৃত অর্থেই আত্মপরিচয়হীন।

মনে পড়ে যাচ্ছে কবি টমাস ডি কুইন্সি-র অল্প বয়সে ঘটে-যাওয়া একটা ঘটনার কথা, যা তাঁর গোটা কবি-জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের পথচলতি মানুষের ভিড়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মেয়েটির সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর পর কিছুদিনের জন্য কবিকে লন্ডন ছাড়তে হলো। ঠিক হলো, এক সপ্তাহ পর থেকে মেয়েটি

প্রতিদিন গ্রেট টিবফিল্ড স্ট্রিটের কোনায় প্রতি সন্ধ্যায় অপেক্ষা করে থাকবে, কিন্তু আর কোনোদিনই তাঁদের দেখা হয় নি।

শহরের প্রতিটি রাস্তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেই অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ-মিলন-বিচ্ছেদের স্মৃতি। একই রাস্তাকে ঘিরে থাকে নানা মানুষের স্মৃতি। শহরের চালচিত্রে ধরা থাকে মানুষের জীবন। শহরের রাস্তা এবং অসংখ্য অচেনা মানুষের ভিড়ে যে-জীবন লুকিয়ে আছে, তার পাঠোদ্ধার জন্ম দিতে পারে নতুন লেখার।

যৌবনে, লেখালেখির জন্য আমি পুরোনো পারি-র টেলিফোন ডিরেক্টরির শরণাপন্ন হই, বিশেষত যেগুলি রাস্তা এবং বাড়ির নম্বর অনুযায়ী সাজানো। পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমার এমন একটা অনুভূতি হয় যেন একটি শহবের এক্স-রে প্লেটটি আমার সামনে ধরা। পারি-কে মনে হয় আটলান্টিসের মতন নিমজ্জিত একটি শহর। তার গায়ে লেগে আছে পুরোনো সময়ের গন্ধ। কারণ বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মানুষের নাম, ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বরের পরিচয়টুকুই এখানে জেগে আছে। কখনো কখনো কোনো নাম হঠাৎ হারিয়ে যেত, যে-নম্বরগুলিতে ফোন করলে আর কোনোদিন কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না। কবি ওসিপ ম্যান্ডেলটাম-এর কয়েকটি পঙ্‌ক্তি পরবর্তীকালে আমাকে নাড়া দেয়—

I returned to my city familiar to tears,
To my vessels and tonsils of childhood years,

Petersburg, [...]
While you're keeping my telephone numbers alive.

Petersburg, I still have the addreses at hand.
That I' ll use to recover the voice of the dead.

আমার ধারণা এই টেলিফোন ডিরেক্টরিগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতেই আমার মনে প্রথম বই লেখার ইচ্ছে জাগে। সেই অসংখ্য নামের ভিড়ে কয়েকটি নাম আমি পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে নিতাম আর সেই-সব অজানা জীবনের কল্পনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিতাম।

একটা বড়ো শহরে নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলা বা হঠাৎ উবে যাওয়া খুব সহজ। একজন অতি সহজেই পরিচয় পালটে নিজের জীবন শুরু করতে পারে। এই হারিয়ে যাওয়া, পরিচয়হীনতা এবং বয়ে-যাওয়া সময় সেই শহরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শহরকে ঘিরে ঔপন্যাসিকদের লেখালেখি এবং কোনো কোনো শহর ও মহান লেখকের নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, যেমন— বালজাক-পারি, ডিকেন্স-লন্ডন, দস্তয়েভস্কি-সেন্ট পিটার্সবার্গ, টোকিও-নাগাই কাফু, স্টকহোম-সেডারবার্গ।

আমাদের প্রজন্ম এই লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত এবং বোদলেয়ার-এর ভাষায় বলতে গেলে আমরাও চেয়েছি 'পুরোনো রাজধানী শহরের তরঙ্গায়িত ভাঁজটিকে' আবিষ্কার করতে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, আমার কৈশোরে, শহর আবিষ্কারের নেশা মনকে ছুঁয়ে

থাকত। শহর বদলাচ্ছে। আমেরিকা এবং তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে শহর পরিণত হয়েছে মেগাসিটিতে। এই সামাজিক যুদ্ধের পরিবেশে শহরের অধিবাসীরা হয়ে উঠেছে একে-অপরের অবহেলার পাত্র। বস্তির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ঔপন্যাসিকরা শহরকে দেখেছেন ডিকেন্স বা বোদলেয়ার-এর চোখ দিয়ে— রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে। আমি দেখতে চাই, ভবিষ্যতের লেখকরা কিভাবে এই পালটে-যাওয়া দৈত্যকায় শহরকে তাঁদের লেখায় ধরেন। কিন্তু এটা আমার ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি বলেই মনে হয়। আমি চেষ্টা করেছি নিতান্ত অচেনা-অজানা মানুষদের জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনাকে একত্রিত করতে এবং এর সময়কাল ১৯৪৫, যা আমার জন্মসালও বটে। একটা শহর ধ্বংস এবং জনশূন্য হয়ে-যাওয়ার ঘটনা ১৯৪৫-এ জন্মানো আরো অনেকের মতো আমাকেও স্মৃতি এবং বিস্মৃতি বিষয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল করে তুলেছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও, আমার মনে হয় মার্সেল প্রুস্ত-এর মতো আর একটি *Remembrance of Things Past* আজকের সময়ে আর সম্ভব নয়। তাঁর বর্ণিত উনিশ শতাব্দীর সমাজ ছিল অনেক স্থিতিশীল। অতীতের স্মৃতি তার সমস্ত অনুপুঙ্খসহ পুনরাবির্ভূত হয়েছিল প্রুস্ত-এর হাত দিয়ে এবং তৈরি করেছিল এক মন্তাজের আমেজ। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় স্মৃতিহীনতা এবং বিস্মৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের ফলে স্মৃতি তার নিশ্চয়তা হারায়। বিস্মৃতির এই চাদর সরিয়ে আমরা অতীতের কোনো মুহূর্তের টুকরো-টুকরো ঘটনা কেবল তুলে আনতে পারি মাত্র। কিন্তু একজন ঔপন্যাসিক নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন বিস্মৃতির মধ্যে এক টুকরো স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখতে; যেভাবে মহাসমুদ্রের বুকে জেগে থাকে হিমশৈলের চূড়া।